আইসিটি নীতিমালা, না ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতিমালা

মোস্তাফা জব্বার

মনে হয়, এ লেখা জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা সংশোধনসহ কোনো বিষয়ে কোনো প্রভাব ফেলবে না। আমি অনেকটা নিশ্চিত এ লেখার কোনো বক্তব্য নীতিমালার সংশোধনীতে ব্যবহার হবে না। অতীত অভিজ্ঞতা সে কথাই বলে। কিন্তু আমলা তাদের বিশেষজ্ঞ মতামত প্রকাশ করবেন, কিছু পরামর্শক সেসব আমলার হুকুম তামিল করবেন এবং আমাদের শিল্প খাতের প্রতিনিধিরাসহ শিক্ষাবিদেরা তাকে অনুমোদন দেবেন। ফলে আরও একটি জগাখিচুড়ি নীতিমালার জগাখিচুড়ি সংশোধনী তৈরি হবে, যাতে তথ্যপ্রযুক্তির সাধারণ ধারণা থাকবে, কাগজে-কলমে অনেক কিছু যুক্ত হবে, কিন্তু 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' থাকবে না। সম্ভবত এর অন্যতম একটি কারণ হলো, আমরা আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যটা বোঝাতে পারিনি। ডিজিটাল বাংলাদেশ যে শুধু একটি আইসিটিকেন্দ্রিক বিষয় নয় এবং এটি যে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলন, সেই ধারণাটি এখনও আমাদের নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, শিল্প খাতের প্রতিনিধি ও বিজ্ঞ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের উপলব্ধিতে আসেনি। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পারার ব্যাপারটি ডিজিটাল যুগে ইলেকট্রনিক কথা বলার মতোই সেকেলে, পুরনো এবং বিভ্রান্তিকর। এখন যখন ই-গভর্নমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, তখন অবশ্য ই-মেইল, ওয়েবসাইট এসব কাজের কথা বলি। কিন্তু বিষয়টি তো হওয়া উচিত ডিজিটাল সরকার, যে সরকার নামে মাত্র ইলেকট্রনিক হবে না, পুরোপুরি ডিজিটাল হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ধারণাটি পুরোপুরিই অনুপস্থিত।

সবিনয়ে বলতে চাই– আমলা, সুশীল সমাজ ও শিল্প খাতের সাথে রাজনৈতিক শক্তিকে যুক্ত না করা হলে নীতিমালার রাজনৈতিক অংশটি অনুপস্থিত থেকে যায়। অন্তত এমন কিছু লোকের এ বিষয়ে ভূমিকা থাকা দরকার, যারা প্রযুক্তিবিদ হলেও রাজনীতি সচেতন। এটি বোঝা দরকার, ডিজিটাল বাংলাদেশ শুধু কতগুলো কুইক উইন, ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র, জেলা বাতায়ন বা ই-সার্ভিস নয় যে নীতিমালায় ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা লিখে দিলেই সেটি জাতির সামনে চলার পথকে নির্দেশ করবে। ২০০৯ সালের নীতিমালাটি কার্যত ডিজিটাল যুগ বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার ধারণাকে দূরে রেখে গতানুগতিক একটি নীতিমালা হিসেবে প্রণীত হয়েছিল। এটি বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের নীতিমালার দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র। আমাদের প্রয়োজন ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতিমালা। আমরা কেনো যে চার বছরেও একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ সংক্রান্ত লিখিত দলিল পেলাম না সেটিও একটি বড় প্রশ্ন।

২০০৮ সালে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার খসড়া যখন প্রণীত হয় তখন আমার একটা তাগিদ ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার নীতিমালা তৈরির জন্য। নীতিমালা নিয়ে রাজেন্দ্রপুরে কর্মশালা করার এক বছর আগে আমি ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ঘোষণা করি। তখন নীতিমালা প্রণেতাদের কেউই তা গ্রহণ করেননি। এরা কোনো একটি দেশের নীতিমালাকে কপি করে তাতে প্রস্তাবনা, স্বত্বাধিকার, রূপকল্প, উদ্দেশ্য, কৌশলগত বিষয় ও কর্মপরিকল্পনা নামের কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে দিয়ে নীতিমালা বানিয়ে ফেলেন। দেশ শাসনে এটি আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের অদক্ষতার পরিচায়ক।

আইসিটি মন্ত্রণালয় অতি সম্প্রতি জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯-এর সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছে। গত ১১ অক্টোবর এ বিষয়ে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হয়েছে। জানি না কী সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, সামনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় তোলা হবে এবং সংশোধনীগুলো কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হবে। কিন্তু ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংশোধনীগুলো নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর প্রায় ২০ মাস সরকার সম্পূর্ণ নীরব ছিল কেনো।

খসড়া, মূলনীতি ও সংশোধনী : ২০১২ সালের অক্টোবরে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে নীতিমালাটি বিতরণ করা হয় তার মুখবন্ধে এর প্রণয়নের ইতিহাস বলা আছে। এতে বলা হয়েছে, আইসিটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রথম কমিটি গঠন করা হয় ১৯৯৬ সালের ১০ মে। সেই কমিটির সুপারিশমালা নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ২০০২ সালে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে, যা মূলত কাগজেই থেকে যায়। সেই নীতিমালাটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয় তাতে কোনো কর্মপরিকল্পনা না থাকার জন্য। এরপর ২০০৮ সালে আইসিটি নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সে সময়ের উপাচার্য ড. জমিলুর রেজা চৌধুরী। কমিটিতে মোট সদস্য ছিলেন ২৫ জন। নীতিমালার জন্য ৭ সদস্যের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপও গঠন করা হয়। এতে ৭ জন সহযোগী সদস্যও ছিলেন। সেই কমিটি আগের নীতিমালাটির পর্যালোচনা করেনি, বরং একটি সম্পূর্ণ নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করে। এটি মার্চ ২০০৯-এ মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয় ও জুলাই ২০০৯-এ অনুমোদিত হয়। এরপর ২০১২ সালের ১০ মার্চ সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২০০৯ সালের নীতিমালাটি পর্যালোচনা করার জন্য ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

আমি ২০০৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পুরো চার বছর নীতিমালার সব কাজের সাথে যুক্ত ছিলাম। ২০১২ সালে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির নতুন নেতা ফয়জুল্লাহ খান আমার স্থলাভিষিক্ত হন। নীতিমালার পুরো অংশটি লিখে প্রণেতাদের দিয়েছি। পর্যালোচনা করার সময় সেগুলো কমিটির সামনে লিখিতভাবে পেশ করেছি। নীতিমালার কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আমি তেমন গুরুত্ব দেইনি। কারণ, এই অংশটি পরিবর্তনশীল। ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা যখন প্রণীত হয় তখন অনেকগুলোর ▸

ডিজিটাল বাংলাদেশ যে শুধু একটি আইসিটিকেন্দ্রিক বিষয় নয় এবং এটি যে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলন, সেই ধারণাটি এখনও আমাদের নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, শিল্প খাতের প্রতিনিধি ও বিজ্ঞ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের উপলব্ধিতে আসেনি। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পারার ব্যাপারটি ডিজিটাল যুগে ইলেকট্রনিক কথা বলার মতোই সেকেলে, পুরনো এবং বিভ্রান্তিকর। এখন যখন ই-গভর্নমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, তখন অবশ্য ই-মেইল, ওয়েবসাইট এসব কাজের কথা বলি। কিন্তু বিষয়টি তো হওয়া উচিত ডিজিটাল সরকার, যে সরকার নামে মাত্র ইলেকট্রনিক হবে না, পুরোপুরি ডিজিটাল হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ধারণাটি পুরোপুরিই অনুপস্থিত।

প্রয়োজনীয়তা ছিল না। অস্পষ্ট ও অবাস্তব হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো নীতিমালায় যুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় আসে। এই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০০৯ সালেই একটি আইসিটি নীতিমালা অনুমোদন করে। এর আগের সরকারের তৈরি করা খসড়ার ভিত্তিতে সেই নীতিমালাটি প্রণীত হয়। এখন সেই নীতিমালাটি সংশোধন করার পর্যায়ে আছে। সেই নীতিমালাটি আইসিটি পলিসি হিসেবে ভালোই। কিন্তু যে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলে সেই সরকারকে শুধু আইসিটি নীতিমালার কথা বললেই চলবে না, সেটিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতিমালায় রূপান্তর করতে হবে। সেই আলোকে ২০০৯ সালের সেই নীতিমালাটির সংশোধন কিভাবে, কোন ভাষায় হওয়া উচিত সে ব্যাপারে আলোকপাত করছি।

কেমন নীতিমালা চাই

এই নীতিমালাটির নাম হওয়া উচিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতিমালা ২০১২'। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান সমুন্নত রেখে নীতিমালার শুরুতেই এর প্রস্তাবনা থাকা দরকার।

কাঠামো ও অনুসৃত নীতি : ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতিমালায় জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯-এ একটি রূপকল্প, ১০টি উদ্দেশ্য ও ৫৬টি কৌশলগত বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এসব কর্মপরিকল্পনার ৩৯টিকে অধিকতর অগ্রাধিকারভিত্তিক এবং ১০২টিকে অগ্রাধিকারভিত্তিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া কর্মপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময়কালের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এ নীতিমালার রূপকল্প হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্য বিষয়গুলো সেই রূপকল্পকে বাস্তবায়িত করার জন্য তৈরি করা।

কর্মপরিকল্পনাগুলো তিনটি মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদী : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ সাল। মধ্যমেয়াদী : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ সাল। দীর্ঘমেয়াদী : ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সাল।

কোনো কোনো কর্মপরিকল্পনা এক বা একাধিক সময়কালে বাস্তবায়ন করতে হতে পারে। কর্মপরিকল্পনার মধ্যে দুই তারকাবিশিষ্ট কর্মপরিকল্পনাগুলো হলো অতি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য। এক তারকাগুলো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং তারকাবিহীনগুলো সাধারণ।

সংজ্ঞা

ডিজিটাল বাংলাদেশ : ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে সেই সুখী, সমৃদ্ধ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ যা সব ধরনের বৈষম্যহীন, প্রকৃতপক্ষেই সম্পূর্ণভাবে জনগণের রাষ্ট্র এবং যার মুখ্য চালিকাশক্তি হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। এটি বাঙালীর উন্নত জীবনের প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। এটি বাংলাদেশের সব মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর প্রকৃষ্ট পন্থা। এটি একাত্তরের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের রূপকল্প। এটি বাংলাদেশের জন্য স্বল্পোন্নত বা দরিদ্র দেশ থেকে সমৃদ্ধ ও ধনী দেশে রূপান্তরের জন্য মাথাপিছু আয় বা জাতীয় আয় বাড়ানোর অঙ্গীকার। এটি বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সোপান। এটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একুশ শতকের সোনার বাংলা।

রূপকল্প : রূপকল্প হচ্ছে এই নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একুশ শতকের সোনার বাংলা, যাকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলা হচ্ছে সেটি গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য : এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো এর রূপকল্প বাস্তবায়ন করা।

কৌশলগত বিষয় : কৌশলগত বিষয় হচ্ছে রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কৌশল বা পদ্ধতি।

কর্মপরিকল্পনা : কর্মপরিকল্পনা হলো রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হচ্ছে তথ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন, সম্প্রচার ও বিচ্ছুরণের জন্য ব্যবহৃত ডিজিটাল প্রযুক্তি।

নীতিমালার স্বত্বাধিকার, তদারকি এবং পর্যালোচনা

এই নীতিমালা সমগ্র জাতির। এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেশের প্রতিটি নাগরিকের। তবে রাষ্ট্র ও জনগণের পক্ষে সরকার এই নীতিমালা বাস্তবায়নে তার দায়িত্ব পালন করবে এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ভেতরের ও বাইরের সব নাগরিকের অংশ নেয়ার বিষয়ে সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী এই নীতিমালার তদারকি ও সমন্বয় করবেন। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক টাস্কফোর্স বা ডিজিটাল বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা মূল তদারককারী ও সমন্বয়কারীর সাথে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বজায় রেখে তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে। সরকারের সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দফতর বা প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালায় প্রদত্ত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করবে এবং এই নীতিমালা বাস্তবায়নে সব ধরনের সহায়তা করবে।

রূপকল্প

এই নীতিমালার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এসব পরিবর্তনের বিষয়গুলো হয়তো ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। নতুন যে সংশোধনীগুলোর কথা বলা হয়েছে তাতে যদিও উদ্দেশ্য, কৌশলগত বিষয় ও কর্মপরিকল্পনাগুলোর পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি এবং শুধু কর্মপরিকল্পনাগুলোর অগ্রাধিকার নির্ণয়ের কথাই বলা হয়েছে, তথাপি এটি খুব স্পষ্ট করে বলা দরকার, এগুলোরও আমূল পরিবর্তন করা দরকার। নীতিমালার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনার পর আগের কৌশল, উদ্দেশ্য এবং কর্মপরিকল্পনা বহাল থাকতে পারে না। উপরন্তু আইসিটি নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়নের সময় যেসব উদ্দেশ্য ও কৌশলগত বিষয়কে আইসিটি নীতিমালায় যুক্ত করা হয়েছিল, তার সাথে আওয়ামী লীগের রূপকল্প ২০২১-এর কোনো সম্পর্ক নেই। যেহেতু এই দলিলটি আওয়ামী লীগ সরকারের সেহেতু সেই রূপকল্পটিকে মাথায় রেখেই ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতিমালা প্রণীত হতে হবে। আপাতত বিদ্যমান অবস্থাটিকে মেনে নিয়ে ২০১৪ সালে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করার জন্য বিষয়টি রেখে দেয়া যেতে পারে। স্মরণে রাখা যেতে পারে, ২০০৯ সালের নীতিমালাটি কোনোভাবেই ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাকে ধারণ করে না।

কর্মপরিকল্পনা : নীতিমালার সংশোধনী প্রস্তাবে একটি তারকা দিয়ে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা কর্মপরিকল্পনাগুলো হলো : ২, ৪, ৫, ৮, ১২, ১৪, ১৫, ১৯, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭৫, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৬, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৯, ১০১, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১২, ১১৪, ১১৬, ১২০, ১২২, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৯, ২০১, ২০৩, ২০৫, ২০৯, ২১১, ২১৪, ২১৫, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৭, ২২৮, ২৩২, ২৩৫, ২৩৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫৪, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৮১। এগুলো পর্যালোচনা কমিটি অনেক সময় ও আলোচনা করে ঠিক করেছে। ফলে এগুলো অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আবার পর্যালোচনা করলে হয়তো আরও দুয়েকটি এই তালিকায় যুক্ত হতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব হলো দুই তারকাবিশিষ্ট অগ্রাধিকারগুলোর প্রতি। দুই তারকাসংবলিত অধিকতর অগ্রাধিকারগুলো হলো : ১, ৩, ৬, ১৭, ৪৮, ৪৯ (এটি বাস্তবায়িত হয়ে গেছে), ৫১, ৫২, ৫৪ (এটিও বাস্তবায়িত হয়েছে), ৫৭, ৬২, (এটি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে), ৬৬, ৭৮, ৮৩, ৮৮, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০৫, ১০৭, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৩, ১৫০, ১৫৯, ১৬৪, ২২৪, ২৪৬, ২৭৭, ২৮২, ২৮৩, ২৮৮, ২৮১ ও ৩০৩। লক্ষণীয়, দুই বছর আগে তৈরি করা এই তালিকায় পরিবর্তন আসতে পারে।

বস্তুতপক্ষে পর্যালোচনা কমিটির কোনো বৈঠক না করে কেনো একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে সংশোধনীগুলো চূড়ান্ত করা হচ্ছে সেটিও বুঝি না। একদিন বিসিসি'র ইডি'র নেতৃত্বে যদি ৭ জনের একটি বৈঠক করে কর্মপরিকল্পনা ও নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হতো, তবে সম্ভবত কাজটি সুন্দর হতো ■

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com